ইমপ্রুভিং চাইল্ড প্রোটেকশন এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল এবিউজ এ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন ইন বাংলাদেশ

EUROPEAN UNION

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুর সুরক্ষা

কমিউনিটির উদ্যোগে

ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহারের নিয়ম

ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য প্রতিটি পাতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি ও শিরোনাম দেয়া আছে। ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহারের আগে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই এর প্রতিটি পাতা ভালো করে পড়ে নিতে হবে, যাতে গল্প এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা থাকে।

- যেন গল্প বলছেন- এমনভাবে আলোচনা শুরু করলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ সহজেই পাওয়া যাবে।
- উপস্থিত সবাইকে গোল হয়ে কিংবা 'ইউ' বা 'ভি' আকারে বসার ব্যবস্থা করে ফ্ল্যাশ কার্ড তাদের সামনা সামনি এমন উচ্চতায় রাখতে হবে যেন প্রত্যেকে সহজে দেখতে পায়।
- ব্যবহারকারীকে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কৌশল অবলম্বন করে রঙিন ছবিগুলো অংশগ্রহণকারীদের দিকে রেখে উল্টোদিকের তথ্যের সাহায্যে তাদেরকে নিজের ভাষায় গল্প ও তথ্য বুঝিয়ে বলতে হবে।
- আলোচনা করার জায়গায় পর্যাপ্ত আলো আছে কিনা এবং সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছবি ঠিকমতো দেখতে পারছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখতে হবে।
- উপস্থিত সকলে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলোচিত বিষয় ও ছবিগুলো তারা বুঝতে পারছে কিনা তা আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে জেনে নিতে হবে।
- আলোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে, অংশগ্রহণকারী যাতে তাদের নিজস্ব মতামত দিতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সঠিক আচরণটি চিহ্নিত করতে পারে।
- আলোচনা শেষে ব্যবহারকারী সারসংক্ষেপ বলে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দেবেন এবং এ ধরনের আলোচনা অধিবেশনে আগামীতে যোগদান করতে অনুরোধ জানাবেন।

শূন্য (০) থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত
সকল মানব সন্তানই শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে

শিশুর বয়স সংশ্লিষ্ট তথ্য

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ অনুযায়ী ১৮ বছর পর্যন্ত সকল মানব সন্তানই শিশু। তবে শিশুর বয়সের আওতাভুক্ত হলেও ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কিশোর-কিশোরী বলা হবে।
- চুক্তি আইন ১৮৭২-এ ১৮ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯ অনুযায়ী ছেলের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়ের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়স্কদের বিবাহের জন্য অনুপোযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- ভোটাধিকার আইনে ১৮ বছরের কম বয়সীদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- নিম্নতম মজুরী আইন- ১৯৬১ অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ না হলে শিশু হিসেবে গণ্য হবে।
- খনি আইন-১৯২৩ অনুযায়ী ১৫ বছর পূর্ণ না হলে শিশু হিসেবে গণ্য হবে।
- মটরযান আইন-১৯৩৯ অনুযায়ী গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে ১৮ বছর বয়সের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু এবং বড় গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে ২০ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (সংশোধিত-২০০৩)-এ ১৬ বছরের কম বয়স্ক মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়েছে।
- শিশু আইন -১৯৭৪ অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ না হলে শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

শারীরিক ও মানসিক শাস্তি এবং যৌন নির্যাতন
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে

শিশুর উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি বা নির্যাতনের সংজ্ঞা

শারীরিক নির্যাতন

হাত দিয়ে, কোনো লাঠি বা কাঠি (কঞ্চি, বেত) দিয়ে, কোনো ধারালো যন্ত্র/অস্ত্র (দা, কাঁচি, খুন্তি) বা অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করে শরীরে যে কোনো ধরনের আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়াই হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন।

মানসিক নির্যাতন

গালি দিয়ে, কুদৃষ্টির মাধ্যমে, অশ্লীল কথা বলে, অপমান বা অবমাননা করে, বিকৃত নামে ডেকে, চাকরি (বাড়িতে বা অন্য কোনো জায়গায় যে শিশুরা কাজ করে) থেকে বাদ দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বা অন্য যে কোনোভাবে মানসিক আঘাত বা কষ্ট দেওয়াই হচ্ছে মানসিক নির্যাতন।

যৌন নির্যাতন

বয়সে বড় কেউ যখন শিশুর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার উপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে বিভিন্ন কৌশলে যেমন- অশ্লীল কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, আদরের ছলে, জোর করে জড়িয়ে ধরে বা ধরার চেষ্টা করে এবং চুমু দিয়ে বা চুমু দেয়ার চেষ্টা করে, লজ্জাস্থানে হাত দিয়ে বা হাত দেবার চেষ্টা করে, খারাপ ছবি দেখিয়ে (কাগজে বা মোবাইলে বা ইন্টারনেটে), কিংবা সম্পূর্ণরূপে যৌন কাজ করা বা যে কোনো ধরনের যৌন কাজে নিয়োজিত করাই হচ্ছে শিশু যৌন নির্যাতন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত অধিকাংশ যৌন নির্যাতন সাধারণত পরিচিতরাই করে থাকে। তারা সাধারণত মজার মজার জিনিস দেয়ার লোভ দেখিয়ে, বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে, আদরের ছলে, ভয় দেখিয়ে বা জোর করে শিশুদেরকে এ ধরনের নির্যাতন করে থাকে।

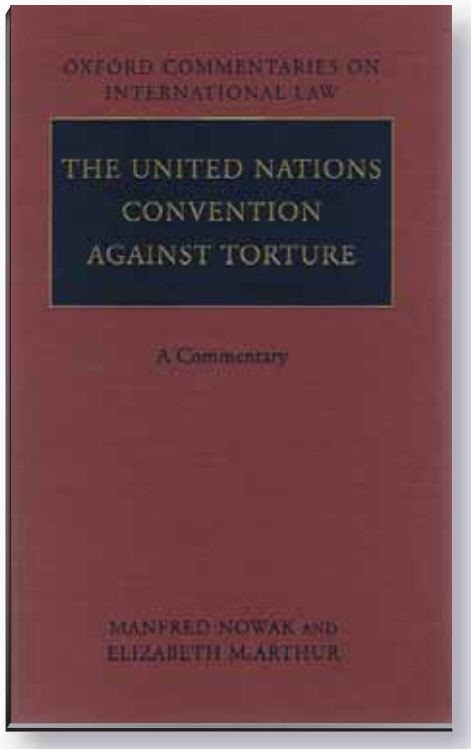

শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায়
সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে।
আসুন, শিশু অধিকার
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের
উপর যৌন নির্যাতনসহ
সকল নির্যাতন
প্রতিরোধ করি।

শিশু অধিকার এবং শাস্তি বিষয়ে জাতিসংঘ সনদ

শিশু অধিকার সনদ হলো জাতিসংঘ কর্তৃক তৈরি করা শিশুর অধিকারের একটি আন্তর্জাতিক দলিল। এই সনদে মূলত শিশুর অধিকারের কথা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল হিসেবে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ শিশু অধিকার সনদ গ্রহণ ও পাশ করে এবং এই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন/অনুস্বাক্ষর করা শুরু করে। স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অর্থাৎ বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের নিকট এমনভাবে প্রতিশ্রুতি (সনদে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে) দিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আইনগতভাবে বাধ্য।

শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকারগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গভেদে সকল শিশুর জন্যই প্রযোজ্য, অর্থাৎ ***বৈষম্যহীনভাবে শিশুদের অধিকার ভোগের সুযোগ*** করে দিতে হবে।

শিশু অধিকার সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

সনদে মোট অনুচ্ছেদ/ধারা ৫৪টি। ১ থেকে ৪১নং অনচ্ছেদগুলোতে সরাসরি শিশু অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

শিশু অধিকার সনদের গুচ্ছসমূহ

১. বেঁচে থাকার অধিকার ২. বিকাশের অধিকার ৩. সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার ৪. অংশগ্রহণের অধিকার ৫. সমাবেশন

মূলনীতি

১. বৈষম্যহীনতা ২. শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ ৩. বেঁচে থাকা ও বিকাশের নিশ্চয়তা ৪. অংশগ্রহণ

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অপমানজনক ব্যবহার বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদ:

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অপমানজনক ব্যবহার বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কর্তৃক তৈরিকৃত সনদটি ১০ই ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে সাধারণ পরিষদের ৩৯/৪৬ নং রেজুলেশন অনুযায়ী গৃহীত হয় এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ২৭(১) অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের ২৬ জুন সনদটি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরের জন্য অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে এই সনদে স্বাক্ষর করে। এই দলিলে ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী, বিশ্বের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের সমান ও অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারগুলোই হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির মূল ভিত্তি।

জাতীয় শিশুনীতির অঙ্গীকার
করতে হবে শিশুর প্রতি
সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্যের প্রতিকার

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১

শিশু ও কিশোর কিশোরী

- শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বোঝাবে।
- কিশোর কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বোঝাবে।

মূলনীতি

- বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- শিশু দারিদ্র বিমোচন।
- শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।
- কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।
- শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ও অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গগত, ধর্মীয়, জাতিগত, পেশাগত, সামাজিক, আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচয় নির্বিশেষে সকল শিশু ও কিশোর কিশোরীর জন্য মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।
- কন্যা শিশু এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- শিক্ষা ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের দেশ সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে শিশুদের একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়।
- শিশুদের জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- শিশু ও কিশোর কিশোরীর জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামত প্রতিফলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আমাদের বিদ্যালয় শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনমুক্ত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১

- দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ জরুরি বিষয়। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নীতিমালার শিরোনাম : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১।
- এই নীতিমালায় 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হচ্ছে- সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্যান্য সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাবে।
- 'শাস্তি' বলতে কোনো ছাত্র-ছাত্রী-কে শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি-কে বুঝাবে।
- 'শারীরিক শাস্তি' বলতে যে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে যে কোনো ধরনের দৈহিক আঘাত করাবে বুঝাবে। যেমন- হাত-পা বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা/ বেত্রাঘাত করা; শিক্ষার্থীর দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় যে কোন বস্তু ছুঁড়ে মারা; আছাড় দেয়া ও চিমটি কাটা ; শারীরিক কোনো স্থানে কামড় দেয়া; চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া; হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল চাপা দিয়ে মোচড় দেয়া ; ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া; কান ধরে টানা বা উঠবস করানো; চেয়ার, টেবিল বা কোনো কিছুর নিচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাটু গেড়ে দাঁড় করে রাখা; রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা; ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
- 'মানসিক শাস্তি' বলতে কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণী কক্ষে এমন কোনো মন্তব্য করা যেমন- মা-বাবা/বংশ পরিচয়/ গোত্র/ বর্ণ/ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করা বা এমন কোনো আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে।

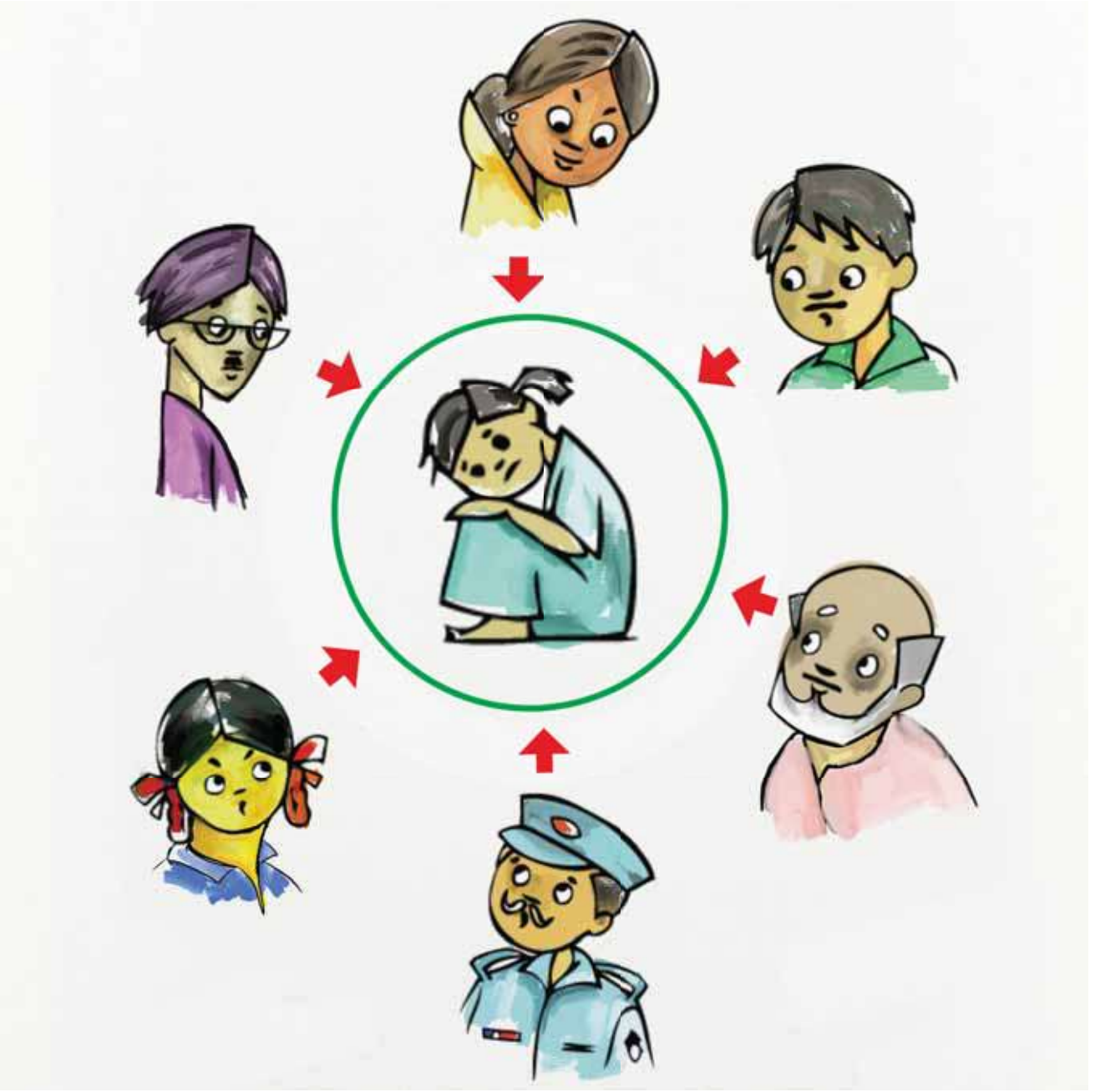

গড়তে শিশুর সুন্দর জীবন, রুখতে হবে যৌন নির্যাতন

যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের হাইকোর্টের নির্দেশনাপত্র অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য অংশ

- অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা।
- অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি বা ইঙ্গিতে) যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা
- যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি
- যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন
- পর্ণোগ্রাফি দেখানো
- যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি বা মেইল অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্যেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্রধারন করা
- প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাক্ষাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা
- চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাকাল্টি, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক ও অপমানজনক কিছু লেখা
- প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা
- যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা।

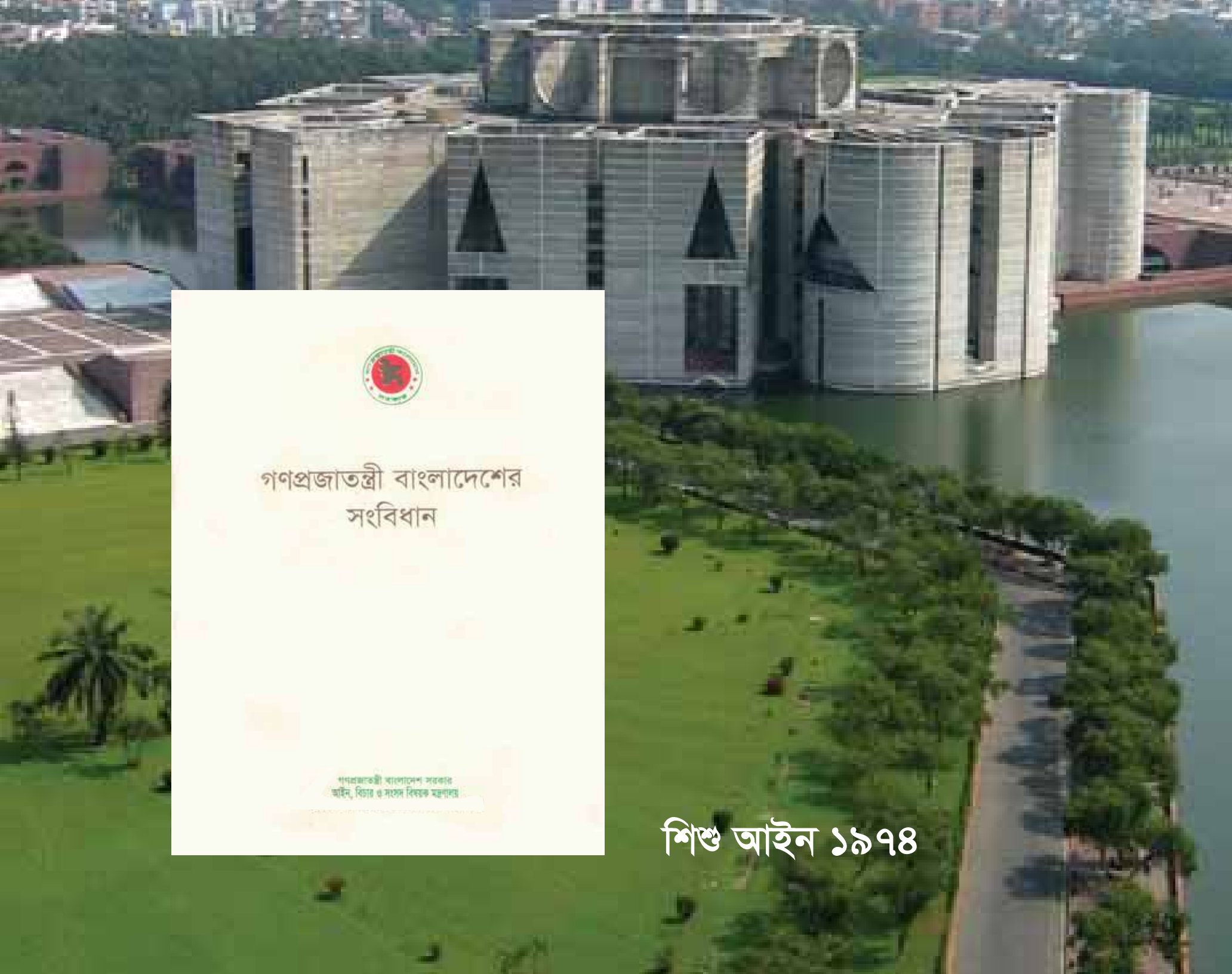
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
সংবিধান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু আইন ১৯৭৪

শিশু আইন বিষয়ক তথ্য

সংবিধানের ৩য় ভাগে সুস্পষ্টভাবে মৌলিক অধিকার অংশে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সকল নাগরিককে বিশেষত নারী ও শিশুদেরকে সকল প্রকার অপরাধমূলক আচরণ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত রাখবে। অনুচ্ছেদ-১১, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৪(১), ৩৬, ১১, ২৭,৩ ১, ৩২, ৩৪(১), ৩৬

শিশু আইন ১৯৭৪

শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার্থে ১৯৭৪ সালে একটি আইন তৈরি করা হয় যা 'শিশু আইন ১৯৭৪' বা 'Children Act 1974' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে এই আইনের আওতায় বিধিমালা তৈরি হয় যা Children Rule 1976 নামে অভিহিত। এ আইনে মোট ৭৮টি ধারা রয়েছে।

'শিশু আইন ১৯৭৪'-এর উদ্দেশ্য

শিশুর হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ, সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং অধিকার নিশ্চিত করা। শিশু আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, একটি অপরাধের জন্য কোনো শিশু যেন চিরকালের জন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত না হয়।

শিশু আইনের মূল লক্ষ্য

শিশু অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে তার সমস্যাবলী সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে, শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে শিশুকে সমাজে পুর্নবাসন করা; শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী শিশুদের প্রতি আইনের কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয় এবং সহানুভূতির সহিত অনুধাবনের জন্য কিছু ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ধারা: ২ (চ) - শিশু অর্থ ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি
ধারা: ৬ - প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে শিশুর যৌথ বিচার করা যাবে না।

ধারা: ১৫ - সাধারণ অপরাধীদের তুলনায় শিশু অপরাধীদের বিচারের বেলায় আদালত- ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স; খ) শিশুর জীবন ধারনের পরিবেশ; গ) প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।
ধারা: ১৭ - শিশুর অপরাধ সম্পর্কিত খবর, ছবি, পরিচয় ইত্যাদি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যাবে না- অন্যথায় ৪৬ ধারায় শাস্তির বিধানমতে সংক্ষিপ্ত মেয়াদে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।
ধারা: ৪৮ - গ্রেফতার হলে থানা থেকেই শিশুকে জামিন দেবার বিধান
ধারা: ৪৯ - জামিন প্রদান করা না গেলে নিরাপদ স্থানে আটক রাখার বিধান
ধারা: ৫১ - মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদানের মতো অপরাধ করলেও শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড দেয়া যাবে না। শাস্তির বদলে সংশোধন– এটাই হল এই আইনের মূল উদ্দেশ্য
ধারা: ৭০ - অপরাধ করার কারণে চাকরি পাবার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে না।

শিশুকে সকল প্রকার নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য
সরকারকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

শিশু অধিকার সনদের ১৯ নং অনুচ্ছেদ

মা-বাবা অথবা শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছে এমন লোকের দ্বারা শিশুর শারীরিক অথবা মানসিক অত্যাচার, দুর্ব্যবহার কিংবা অন্য কোনো ধরনের অত্যাচার যেমন: যৌন নিপীড়ন ইত্যাদির হাত থেকে সরকার শিশুকে রক্ষা করবে। সকল অত্যাচার রোধের জন্য এবং যে সকল শিশু এই ধরনের অত্যাচারের শিকার, তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার যথাযথ সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

যৌন নির্যাতন শিশুর মধ্যে মানসিক ক্ষত তৈরি করে
যা তার স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করতে পারে

শিশু অধিকার সনদের ৩৪ নং অনুচ্ছেদ

সরকার শিশুদেরকে সকল প্রকার যৌন শোষণ এবং যৌন নিপীড়ন যেমন বেআইনী যৌনকর্ম, পতিতাবৃত্তি এবং অশ্লীল রচনা/চিত্র থেকে রক্ষা করবে।

শিশুর প্রতি নির্যাতনকারীকে অবশ্যই বিচারের আওতায়
আনতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাই অগ্রগণ্য

বর্তমান আইনে শিশুর প্রতি নির্যাতনকারীর শাস্তি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

ধারা: ৯ - শিশুকে ধর্ষণ করলে অথবা ধর্ষণের ফলে শিশু মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে।

ধারা: ৬ - শিশু পাচার করার কারণে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে।

ধারা: ৭ - কোনো শিশুকে অপহরণ করলে ১৪ বছরের কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে এবং কোনো শিশুকে যৌন নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতন করলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে।

শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা: ৩৪ - শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করলে ২ বছর কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড

ধারা: ৩৫ - শিশুকে ভিক্ষা বৃত্তিতে নিয়োগ করলে ১ বছর কারাদণ্ড বা ৩০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড

ধারা: ৩৭ - শিশুকে মদ বা জীবন হানিকর ওষুধ প্রদান করলে ১ বছর কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড

ধারা: ৪১ - শিশুকে পতিতালয়ে থাকার অনুমতি প্রদান করলে ২ বছর কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড

ধারা: ৪৪ - শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করলে এবং তার উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করলে ১ বছর কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড।

শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে কমিউনিটির উদ্যোগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে কমিউনিটির করণীয়

বিশ্বাস করা : শিশুর অধিকার সম্পর্কে সকলকেই জানাতে হবে, যাতে তারা শিশু অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারে। তবে এর পাশাপাশি শিশুরা পরিচিত বা অপরিচিত উভয়ের দ্বারাই শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে এ বিষয়টিও বিশ্বাস করতে হবে। নিজেকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে, তেমনি পরিবারের সকল সদস্যকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে।

সাবধানতা: শিশুকে এমন কারো কাছে একাকী রাখা যাবে না, যার সম্পর্কে আমি পুরোপুরি জানি না। একটি শিশু কাকে পছন্দ করছে সে দিকও দেখতে হবে। তার অপছন্দনীয় কারো সাথে অবস্থানের জন্য শিশুকে জোর করা যাবে না। শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। অন্যদিকে, আপনার শিশু বা আপনার দায়িত্বে থাকা শিশু কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের বেশি সময় ধরে বিনা অনুমতিতে কোথাও অবস্থান করছে কিনা, কোনো প্রলোভনের শিকার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজর দিতে হবে।

ভালো ও মন্দ আচরণ বা স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে সহযোগিতা করা : অভিভাবক হিসেবে আপনি যদি শিশুকে সব সময় শারীরিকভাবে আঘাত করেন বা গালমন্দ বা অবমাননা করেন কিংবা আদরের ছলে তার ব্যক্তিগত অংগে স্পর্শ করে আদর (চুমু দেয়া, অযথা কোলে নিয়ে জোরে চাপাচাপি করা, যৌনাঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করা) করেন, তাহলে শিশু আপনার এবং নির্যাতনকারীর নির্যাতনমূলক আচরণকে আলাদা করতে পারবে না। অভিভাবককে প্রথমে শিশুর সাথে ভালো আচরণ করতে হবে যাতে সে ভালো ও মন্দ আচরণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং অভিভাবকদের জানাতে পারে।

শিশুকে 'না' বলতে শেখানো: পরিচিত বা অপিরচিত যে কোনো ব্যক্তিই যদি শিশুর সাথে মন্দ আচরণ করে কিংবা করার চেষ্টা তাহলে শিশুকে জোরে 'না' বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

এলাকার সবাইকে সচেতন করা এবং সচেতন করার পরিবেশ তৈরি করা: নিজে একা শিশু অধিকার ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন হলে চলবে না। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের সকলের সচেতনতার পাশাপাশি অংশগ্রহণ অতি জরুরি।

শিশুকে শরীরের সীমানা সম্পর্কে ধারণা দেয়া : শিশুদেরকে তাদের শরীরের সীমানা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের সীমানা রক্ষায় উদ্যোগী হয়। শিশুদের ভাষায় বলা যায়-

দুই হাত দিয়ে তৈরি ত্রিভুজ আকার,
সেইতো শরীরের সীমানা সবার।

কিংবা

মন্দ আদর রুখবো, নির্যাতন বুঝবো,
সীমানায় হাত বাড়ালে বাঁচার উপায় খুঁজবো।

সুরক্ষা শিক্ষাকে পাঠ্যপুস্তকে আনার জন্য সর্বস্তর থেকে দাবি ওঠানো: পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে সকল প্রকার শিশু নির্যাতন বিষয়ক আলোচনা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কারণ এ শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর জীবনদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং শিশু তার বয়স অনুযায়ী অধিকার, নির্যাতন ও সুরক্ষা সম্পর্কে তথ্য পাবে। জীবন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে রক্ষায় করণীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

নির্যাতনের শিকার শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাউন্সিলিং সহায়তার পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তাও নিশ্চিত করতে হবে

নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য করণীয়

- সব ধরনের কৌশল অবলম্বনের পরও কিংবা কৌশলগুলো সম্পর্কে শিশু ও অভিভাবকগণ না জানার কারণে যদি কোনো শিশু নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে তার জন্য সবাই মিলে সব ধরনের সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন-
- মানসিক সান্ত্বনা দেয়া
- কাউন্সিলিং সহায়তা প্রদান
- চিকিৎসা সেবা প্রদান করা
- আইনের সহায়তা নেয়া
- নির্যাতনের শিকার শিশু ও তার পরিবারের সদস্যদের বুঝানো যে, এ ঘটনার জন্য শিশুটি নয় বরং নির্যাতনকারীই দোষী। এভাবে বলা যায়-

  যদি হয় কোন শিশু নির্যাতনের শিকার,
  নির্যাতকই আসল দোষী, নয়তো শিশু আর

- শিশুর প্রতি যে কোনো ধরনের নির্যাতনই সামাজিকভাবে ও আইনের দিক থেকে অপরাধ ও খারাপ কাজ

সর্বোপরি বলা যায়, এই তথ্যগুলো শুধু নিজে জানলেই হবে না তা আমাদের পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী ও ছোটদেরকেও জানাতে হবে, যাতে সকলে মিলে শিশুর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আর শিশুদেরকে যে কোনো (ভালো বা খারাপ) বিষয়েই বাবা-মা বা অভিভাবকদের সাথে বিনা সংকোচে আলোচনা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।